গ্রন্থ সমালোচনা

নাসরীন জাহানের *যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে*

অগ্নি অধিরূঢ়

একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু নারী :

সমকালীন বাংলা গদ্য সাহিত্যে নাসরীন জাহান একটি অন্যতম নাম। তাঁর রচনায় আধুনিক মনোভঙ্গী বিশেষত নারী মানস একটি অসাধারণ মানবিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পেরেছে। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন নারীর মর্মকথাকে, মনোবৈকল্যজাত অস্থিরতাকে। তাঁর রচনার স্বকীয় ভাষাভঙ্গী, মনোবিশ্লেষণ সক্ষমতা, নারীর বিক্ষত ব্যক্তিত্বের আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের দিগন্তে নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছে।

নাসরীন জাহানের গদ্যরচনায় নারীর আত্মজিজ্ঞাসা মানবিক রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শোষিত শ্রেণীর প্রতীক নারীরাও এখন দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হিন্দু ও মুসলমান। সমকালের পু রুষতান্ত্রিক নারীবিদ্বেষী সমাজ কাঠামোয় মুসলিম নারীর সমস্যার সাথে হিন্দু নারীর সমস্যার বিস্তর পার্থক্য আছে। সমাজসচেতন নাসরীন জাহান নারীর ক্ষতবিক্ষত চৈতন্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিন্দু নারীর মনোলোকে ভিন্ন তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর '*যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে*' উপন্যাসে তিনি একজন হিন্দু নারীর জীবন পরিক্রমাকে যথাযথ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন হিন্দু নারী সরযু। সে আমাদের সামনে দাঁড় করায় প্রচলিত কয়েকটি সামাজিক বাস্তবতাকে। সরযু নিজের বুদ্ধি দিয়ে, মনন দিয়ে, উপলব্ধি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে যা গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তাকে সে বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে দেখেনি। সে প্রতিনিয়ত তার সরল মনের পরাজয় দেখতে পেয়েছে। সে অল্প বয়সেই যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে তা সত্যিই বড় প্রকট।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বাঁচাবার জন্য সরযু তার পরিবারকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে যেতে দেখেছে। সে দেখেছে, তার পিতার যে মুসলিম বন্ধুটি যুদ্ধপুর্ব সময়ে পরম মমতাবান ছিলেন, যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে সেই একই ব্যক্তিটি কেমন প্রবলভাবে মুসলিম হয়ে যাচেছ। পাকিস্তানী হানাদাররা সরযুর চোখের সামনেই তার দুইভাইকে লুঙ্গি খুলে পরীক্ষা করে গুলি করে মেরে ফেলে। তাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে পুড়িয়ে ফেলে সমস্ত গ্রামটাও। পাকিস্তানী সৈন্যরা এবং যার রূপে সরযু মুগ্ধ হয়েছিল সেই সুদর্শন পাকিস্তানী তরুণ অফিসারটি জান্তব উল্লাসে তাকে তার পিতার সামনেই ধর্ষণ করে। সরলপ্রাণা কিশোরী সরযু বুঝতে পারেনা এত সুদর্শন পুরুষ কিভাবে এমন আচরণ করতে পারে। তার বিশ্বাসের সরল রেখা এখানেই হোঁচট খেয়েছিল। এই সরযু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পিতার দীর্ঘদিনের বন্ধু বিদেশে থাকা স্ত্রী-পুত্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা শফিউল আলমের প্রেম প্রতারণার ফাঁদে পরে ধর্মান্তরিত হয়।

সরযু চেয়েছিল একটু বাঁচতে। সামাজিক মর্যাদা দিতে অক্ষম পিতার কাছে নয়, সমাজে বীরাঙ্গনা হিসেবে নয় নিজের মত করে একটু বাঁচতে। '৪৭ এ দেশভাগের সময় যখন পরিবারের সবাই ভারতে চলে যাচ্ছিল, তখন সরযুর পিতা গর্বভরে বলেছিল এ দেশ আমার, এর আকাশ, বাতাস আমার, এটাই আমার মাতৃভুমি, আমি কেন চলে যাবো। '৪৭ এর সেই গর্ব '৭১ এ এসে কোথায় নেমে গেছে তা উপলব্ধি করে তার পিতা সেই যে ভেঙ্গে গেছেন আর পারেননি নিজেকে সোজা করতে। তাই চোখের সামনে কন্যার ধর্ষণ দেখা বিধ্বস্ত পিতার আশ্রয়ে নয়, নিজের সমস্ত ভালোলাগা, ভালোবাসা, উন্মাদনা, জ্ঞান, উপলব্ধি, কৌতুহল, আশ্রয় নিয়ে একটুখানি নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল সরযু। কিন্তু পারেনি। রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক সমাজ তাকে দিতে পারেনি একটুখানি সবুজ ভুখণ্ড যেখানে সে নির্ভাবনায় এক বুক শ্বাস নিতে পারে। তাই সে প্রেম রোমাঞ্চ ইত্যাদি অনুভুতির স্পর্শ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলেছিল। বেঁচে থাকা, শুধু কোনরকমে নিজের ভিতরে একটি অনবরত প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে রাখার জন্যই সরযু মেনে নিয়েছিল তার স্বামী নামক ব্যক্তিটির যাবতীয় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শাসনকে।

তার কাকু তাকে বলেছিলেন "সব ধর্মগ্রন্থই পবিত্র,....সব ধর্মগ্রন্থেই সুন্দর কথা থাকে। যেটার যা ভালো লাগে তাই গ্রহণ করবি।" এই উদার ও সহনশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা সরযু মোহাম্মদের মেরাজের ঘটনাকে ফ্যান্টাসী বললে স্বামী শফিউল আলম প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তার মুখ চেপে ধরে। অথচ তিনি অনায়াসে বলে যেতেন– "হিন্দু ধর্মে হাজারো দেবদেবী, উদ্ভট সব কাহিনীর ছড়াছড়ি, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।" সরযু সমান যুক্তিতে তর্ক করতো– "ধর্ম মানেই তো বিশ্বাস।

কোন ধর্মের বাস্তব ভিত্তিটা আছে? ইসলাম ধর্মে কি হযরত আলীর বাঘ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নেই? মোহাম্মদের মেরাজের ঘটনার মধ্যেও তো চুড়ান্ত রকমের অলৌকিকতা আছে।" কিন্তু তার স্বামী মেনে নেননি। "সরযুকে ক্রমাগত বিন্যাস্ত করতে তিনি মুহম্মদের হেরা পর্বতের ঘটনা থেকে শুরু করে ইসলাম ধর্মের মানবিক দিক সরযুর সামনে তুলে ধরলেন"। তার উদ্দেশ্য ছিল সরযুর মন থেকে আজন্ম লালিত হিন্দু সংস্কারগুলো মুছে ফেলার। কিন্তু "না, মুছে যায়নি, সরযুর ভেতর থেকে যাবতীয় দ্বন্দ্বের কোন সুরাহা হয়নি। যেদিন সে ধর্মান্তরিত হয়, সেদিনকার মর্মান্তিক অনুভুতি তাকে রক্তাক্ত করেছে পরবর্তী প্রতিটি সময়কে। তার জড়কণ্ঠ থেকে উ□চারিত হওয়া বাক্য, যা তাকে চিরজীবনের জন্য করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেছিলো, তাকে মনেপ্রাণে নিজের মধ্যে সহজ করে তুলতে চাওয়ার প্রক্রিয়াটাই তার জন্য হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে মারাত্মক।" কারণ "সেজদায় গিয়েও সরযুর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো দুর্গার মুখ।....নিজের ভেতরে লালন করা আজন্ম সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে ভয়ে সরযুর হাত-পা জমে আসতো।" মনে "ভেসে উঠতো তাদের পুজোর ঘরে রাখা মুর্তিটির মুখ, মা আর সে মিলে যাকে নিজেদের ভেতরে প্রবলভাবে জীবন্ত করে তুলেছিলো।"

ইসলাম ধর্মবাদী শফিউল আলম "সরযুকে কব্জা করার পরই" বারবার বলতেন–

"তোমার এই শরীরটা মিলিটারীরা ঘেঁটেছে ভাবলেই কেন জানি আমার গা ঘুলিয়ে আসে।
সরযু চীৎকার করে উঠেছিলো-তাহলে আমাকে বিয়ে করেছেন কেন?.....

আপনিও তো বহু বছর একজন নারীর সাথে শুয়েছেন, আপনার বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে, আমার ঘেন্না লাগতে পারে না?"

সরযু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে তার স্বামীর ধর্ম আর পশু পাকিস্তানীদের ধর্মও যে এক তা উল্লেখ করেনা। সরল কিশোরী সরযু বুঝতে পারে না সমস্যাটা কোথায়?

তারপরও একদিন তার মনে প্রশ্ন জাগে, "আমি নিজের জীবন নষ্ট করতে পারি, কিন্তু সন্তানের মাথা থেকে ছাদ তুলে নেয়ার অধিকার ভগবান আমাকে দেননি। এই নিয়েই ভয়ে ভয়ে সে স্বামীর মুখোমুখি হয়েছিল, আচ্ছা, আমার সন্তান যদি পুজো উৎসব করতে চায় তো করতে দেবেন?

কেন সে ওসব উৎসব করবে? কুৎসিত হয়ে উঠেছিল শফিউল আলমের মুখ।
সরযু সশব্দে আছড়ে পড়েছিলো-তাহলে সে ঈদও করবে না।"

সরযু বুঝতে পারে না সমস্যাটা কোথায়। বিবাহ পুর্ববর্তী ও পরবর্তী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাই সে অন্য আর একজন ধর্মান্তরিত নারীর কাছে যায়। তিনি বিশটি বছর ধরে সংসার করছেন। সরযু শুনেছে তিনি সুখী জীবন যাপন করছেন, তার নিজের মতো বিপন্ন নন। তারপরও মহিলা সরযুর প্রশ্নে কিঞ্চিত কেঁপে উঠেছিলেন– "যেন তার জমাট শ্যাওলায় এত বছর পর কেউ নাড়া দিলো।" তিনি বলেছিলেন– "আমার বিয়ের সময় তাকে আমি নাস্তিক হিসেবেই জানতাম। পরবর্তী জীবনে এই বিষয়ে তার মন পাল্টাতে থাকে। প্রথম দিকে প্রেমের রোমাঞ্চটাই আমাদের মধ্যে বড়ো ছিলো, এর ফাঁক গলিয়ে ধর্মের সাধ্য ছিলো না মাথা ঢোকায়।" সরযু নিষ্পলক চোখে মহিলার গোপন বেদনার কথা শুনে যায়। সে বুঝতে পারে এই সমাজে এই চিত্র প্রতিটি ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীর। প্রেমের প্রতি নারীর অগাধ ভক্তি ও আকর্ষণকে পুঁজি করে ও একপেশে আইনী সমর্থন নিয়ে বেড়ে চলে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ। মহিলা একঘেয়ে স্বরে বলেই চলেন– "সে তার পাল্টে যেতে থাকা বিশ্বাসকে আমার ওপর চাপাতে চাইলে যা হওয়ার হলো, কঠিন দুরত্ব সৃষ্টি হতে থাকলো দু'জনের মধ্যে। দুজনেরই মনে হতে থাকলো, আমরা একে অপরকে ঠকিয়েছি। যা হোক, এক পর্যায়ে সমঝোতায় এসেছি, সন্তানদের ওপর আমরা কেউই নিজেদের মত চাপাবো না। তারা বড় হয়ে যা ভালো বোঝে করবে।" এর ফল হলো সত্যি অভাবিত। ওই মহিলার বাসায় এখন পিতার উৎসাহেই সন্তানেরা ধর্মের একাধিক উৎসব পালন করে থাকে যার মধ্যে একটি উৎসবও স্বদেশী ধর্ম হিন্দুর নয়। সরযু বুঝতে পারে নারীর প্রতারিত হওয়ার পদ্ধতি কতই না বিচিত্র রকমের। তবে উপায়হীন নারী বিচিত্র উপায়েই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। সরযুও করেছে। পাশের বাড়ির বিধবা মাসীর ছেলে তিন দিন আগে হারিয়ে গেলে সরযু মর্গ থেকে একটি লাশকে চিহ্নিত করে। লাশের দাহ হয়ে যাবার পর সরযু স্বীকার করে লাশটি সেই ছেলেটির নয়। তখন সমাজ প্রশ্ন করে, "আপনি এ-কি করলেন? এটা যদি কোনো মুসলমানের লাশ হয়? এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি ওকে চিতায় ওঠালেন? লাশের সামনে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনি দিলেন?

সরযু স্থির কণ্ঠে বলে আমার ভেতর কি এক জেদ কাজ করছিলো, আমি মুসলমান হয়েছি, একজন মুসলমানকে হিন্দু করে যদি শোধ নেয়া যায়?"

সরযু যে সমাজে রাষ্ট্রে বেড়ে উঠেছে সেখানে এমন আচরণ মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বরং সে সারা জীবন ধরে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এটাই যেন স্বাভাবিক, সুস্থতা। সামাজিক স্ববিরোধিতার নির্মম শিকার সরযু মনে করে-"আমি আমার মায়ের ধর্মের কিছুটা বিশ্বাস করি, কিছুটা স্বামীর ধর্মের। কি রকম একটা সমস্যা হবে না? কিন্তু রক্তে-মাংসে, মনে-প্রাণে নিজেকে হিন্দুই মনে হয়। আবার মনে হয় ও থেকে কবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়িয়ে এসেছি। ...আমি নাস্তিক নই-ভগবানকে ভীষণ ভয় আমার।" সরযু তথাকথিত উদারবাদীদের মতো নিজেকে আড়াল করতে চায়নি। তার সরলতা তাকে জীবনবিচ্ছিন্ন করেনি। সরযু জানে তার দেশের নীল আকাশ, ভেজা বাতাস, উর্বরা পলল ভুমি এবং নিবিড় বৃক্ষছায়া তার সাথে মিথ্যাচার করতে পারেনা। যতটা পারে বিদেশী দর্শন-সংস্কৃতিবাহী দালাল মানুষেরা। বিদেশের রূক্ষ মরুভুমি ও স্বদেশের স্নিগ্ধ প্রকৃতি এ দুয়ের মর্মকথার দ্বিত্ববোধ সরযুর চেনা হয়ে গেছে। তাই আজন্ম অনুভুত হওয়া প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতাকে সরযু বিসর্জন দিতে পারেনি। তারপরও সে মুক্তি পায়না; স্বামীর মৃত্যুর পর একা হয়ে যাওয়া সরযু পরিণত হয় রক্ষিতায়। সাথে সাথে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বয়ে চলে জীবনের ভার। স্বামীর প্রবল শক্তিশালী ধর্ম তাকে রক্ষা করতে পারেনা এই মহাকালিক পতন থেকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ভ্রষ্টা নারীর এ যেন এক চিরকালীন ও সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। নাসরীন জাহান তাঁর "যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে" উপন্যাসে নারীর মনোজগতের বিভিন্ন বিচিত্র আন্তপরিবর্তনগুলো যথাযথভাবে আঁকতে চেয়েছেন। তাই তিনি সমাজব্যবস্থাকে পাশ কাটাতে পারেননি। সমাজ কাঠামোর গভীর অন্তর্বাস্তবতাকে আড়াল করতে চাননি। নাসরীন জাহান সরযুকে আঁকতে গিয়ে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি নারীবাদকে আবেগ ও যুক্তির মিশেলে বাস্তবানুগভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। সরযু চরিত্রে তিনি নারীর লৈঙ্গিক ভেদরেখাকে ব্যক্তিক জীবনবীক্ষায় মুর্ত করে তুলেছেন। তিনি মানবিক বাস্তবতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করতে সফল হয়েছেন।